সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের ক্ষেত্রে করণীয়

من أحكام المولود

< بنغالي >

সানাউল্লাহ নজির আহমদ

ثناء الله نذير أحمد

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের ক্ষেত্রে করণীয়

পৃথিবী জুড়ে মুসলিমদের ঘরে ঘরে প্রতি দিন আগমন হচ্ছে নতুন মেহমান ও নতুন সন্তানের। কিন্তু আমরা কজন আছি যারা এ সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের সূচনা লগ্নে ইসলামি আদর্শের অনুশীলন করি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতলানো সব সুন্নতগুলো পালন করি? পরিতাপের বিষয়, আমরা অনেকেই তা করি না। এর কারণ, সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে আমাদের উদাসীনতা। তবে এটাও ঠিক যে, ইচ্ছা থাকা সত্বেও অনেকে না-জানার কারণে তা করতে সক্ষম হয় না। আবার কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে ইসলামি আদর্শ ত্যাগ করে বিধর্মী ও অমুসলিমদের অনুসরণ করে, অথচ তারা মুসলিম। যেমন, জন্মদিন পালন, জন্মদিনের কেক কাটা ইত্যাদি, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। এর সঙ্গে নেই কোনো ইসলামের সম্পর্ক; বরং এটা মুসলিম জাতির অধঃপতনের ‘আলামত এবং নিজ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমি এ নিবন্ধের মাধ্যমে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। হয়তো কোনো মুসিলম ভাই কাফিরদের অনুসরণ ত্যাগ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবে। নিজ সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনায় ইসলামের নিদর্শনা মেনে চলবে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর করণীয়

১. সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আল্লাহর প্রসংশা করা:

সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আল্লাহর প্রসংশা করা, তার শুকরিয়া আদায় করা ও সন্তানের জন্য দো‘আ করা। পবিত্র কুরআনে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, সন্তান লাভ করার পর তিনি বলেন,

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ ۚ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۝٣٩ رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ۝٤٠﴾ [ابراهيم: ٣٩، ٤٠]

“সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার রব দো‘আ শ্রবণকারী। হে আমার রব, আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব! আর আমার দো‘আ কবুল করুন।” [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩৯-৪১]

তদ্রূপ আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়ীদের সুসংবাদ প্রদান করা, সন্তানের জনক-জননীকে মোবারকবাদ দেওয়া ও তাদের খুশিতে অংশ গ্রহণ করা। পবিত্র কুরআনে এসেছে,

﴿وَٱمْرَأَتُهُۥ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَٰهَا بِإِسْحَٰقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَٰقَ يَعْقُوبَ ۝٧١﴾ [هود: ٧١]

“আর তার (ইবরাহীমের) স্ত্রী দাঁড়ানো ছিল, সে হেসে উঠল। অতঃপর আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের ও ইসহাকের পরে ইয়াকূবের।” [সূরা হূদ, আয়াত: ৭১]

এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্ত্রীকে সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। অন্যত্র বলা হয়েছে,

﴿فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّى فِى ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ﴾ [ال عمران: ٣٩]

"অতঃপর ফিরিশতারা তাকে ডেকে বলল, সে যখন কক্ষে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩৯]

অন্যত্র বলেন,

﴿يَٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ ٱسۡمُهُۥ يَحۡيَىٰ لَمۡ نَجۡعَل لَّهُۥ مِن قَبۡلُ سَمِيّٗا ٧﴾ [مريم: ٧]

"হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম ইয়াহইয়া। ইতিঃপূর্বে কাউকে আমি এ নাম দেই নি।" [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৭]

এ আয়াত দু'টিতে আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়া আলাইহিস সালামকে সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। অন্যত্র এসেছে,

﴿فَأَوۡجَسَ مِنۡهُمۡ خِيفَةٗۖ قَالُواْ لَا تَخَفۡۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٖ ٢٨﴾ [الذاريات: ٢٨]

"এতে তাদের (ফিরিশতাদের) সম্পর্কে সে (ইবরাহীমের স্ত্রী) মনে মনে ভীত হলো। তারা বলল, ভয় পেয়োনা, তারা তাঁকে এক বিদ্বান পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।" [সূরা আয-যারিয়াত, আযাত: ২৮]

এসব আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সন্তান (ছেলে বা মেয়ে) জন্মের পর খুশি হওয়া, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং সন্তানের জন্য দো'আ করা ইসলামের আদর্শ বরং সওয়াবের কাজ। লক্ষণীয় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এ সময়ও পিতা-মাতা ও মুমিনদের জন্য দো'আ করতে ভুলেন নি।

ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "সন্তান জন্মের সংবাদ পেলে সন্তানের জন্য কল্যাণ ও বরকতের দো'আ করা কর্তব্য"।[1]

হাসান ইবন আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কারো সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ শুনলে এ বলে দো'আ করতেন,

بورك لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره

"আল্লাহ তোমার জন্য এ সন্তানে বরকত দান করুন। তুমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর। এ সন্তান তাঁর পূর্ণ শক্তিমান অবস্থায় উপনীত হোক। আর আল্লাহ তোমাকে এর সদ্ব্যবহার দান করুন"।[2]

২. সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডান কানে আজান দেওয়া:

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডান কানে আযান দেওয়া সুন্নত। আবূ রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, ফাতেমার ঘরে হাসান ইবন আলী ভূমিষ্ঠ হলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে তার কানে আযান দিতে দেখেছি।[3]

আর বাম কানে একামত দেওয়ার ব্যাপারে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা বিশুদ্ধ সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়।

৩. তাহনিক করা:

---

[1] তুহফাতুল মওলূদ

[2] ইমাম নববির আযকার গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

[3] আবু দাউদ, তিরমিযী, সহীহ সূত্রে

ইমাম নববি রহ. বলেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে খেজুর দিয়ে তাহনিক করা সুন্নত। অর্থাৎ খেজুর চিবিয়ে নবজাতকের মুখের তালুতে আলতোভাবে মালিশ করা এবং তার মুখ খুলে দেওয়া, যাতে তার পেটে এর কিছু অংশ প্রবেশ করে। তিনি বলেন, কতক আলেম বলেছেন, খেজুর সম্ভব না হলে অন্য কোনো মিষ্টি দ্রব্য দিয়ে তাহনিক করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, সবার নিকটই তাহনিক করা মুস্তাহাব, আমার জানা মতে এ ব্যাপারে কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেন নি।[4]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ তালহা ভূমিষ্ঠ হলে আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি বলেন, তোমার সঙ্গে কি খেজুর আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর চিবালেন। অতঃপর তা বের করে বাচ্চার মুখে দিলেন। বাচ্চাটি জিব্বা দিয়ে চুসে ও ঠোটে লেগে থাকা অংশ চেটে খেতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এ দৃশ্য দেখে বলেন, দেখ, আনসারদের খেজুর কত প্রিয়![5]

আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার এক সন্তানের জন্ম হলে, আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট নিয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রাখেন ইবরাহিম। অতঃপর খেজুর দিয়ে তাহনিক করেন, তার জন্য বরকতের দো'আ করেন এবং আমার কাছে ফিরিয়ে দেন। এটা আবু মুসার বড় সন্তানের ঘটনা।[6]

৪. সপ্তম দিন মাথা মুণ্ডন করা ও চুলের ওজন পরিমাণ রুপা সদকা করা:

আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম দিন হাসান ও হুসাইনের চুল কাটার নির্দেশ দেন এবং চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য সদকা করেন। ছেলে কিংবা মেয়ে হোক জন্মের সপ্তম দিন চুল কাটা সুন্নত। সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেক সন্তান তার আকিকার বিনিময়ে বন্ধক হিসেবে রক্ষিত। অতএব, সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে আকিকা কর, তার চুল কাট ও তার নাম রাখ।[7]

নবজাতকের চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য সদকা করা সুন্নত। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হাসানের পক্ষ থেকে একটি বকরি আকিকা দিয়েছেন এবং বলেছেন, হে ফাতেমা, তার মাথা মুণ্ডন কর ও তার চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য সদকা কর।[8]

হাফেয ইবন হাজার আসকালানী রহ. বলেন, সব বর্ণনাতে রৌপ্যের কথাই এসেছে। (তালখিসুল হাবির) হ্যাঁ, অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনাতে রৌপ্য বা স্বর্ণ সদকার কথাও বলা হয়েছে।

---

[4] শরহে মুহাজ্জাব: ৮/৪২৪

[5] সহীহ মুসলিম

[6] সহীহ বুখারী ও মুসলিম

[7] আহমদ, তিরমিযী। সহীহ সূত্রে

[8] তিরমিযী

৫. আকিকা করা:

আকিকার আভিধানিক অর্থ: আল্লাহর দরবারে নজরানা পেশ করা, শুকরিয়া আদায় করা, জানের সদকা দেওয়া ও আল্লাহর নি'আমতের মোকাবেলায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। ইসলামী পরিভাষায় আকিকা হচ্ছে, নবজাতকের পক্ষ থেকে পশু জবেহ করা। আলেমদের অনেকেই আকিকা করাকে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ বলেছেন।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইনের পক্ষ থেকে একটি করে বকরি জবেহ করেছেন।[9]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় রয়েছে, দুটি বকরি জবেহ করেছেন। খায়সামি রহ. বলেছেন, আনাসের বর্ণনা শুদ্ধতার বিচারে বুখারী-মুসলিমের বর্ণনার সমমর্যাদা রাখে।

ইমাম মালেক রহ. তার মুআত্তায় বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার সন্তান হয় সে যদি সন্তানের পক্ষ থেকে আকীকা করতে চায়, তবে তা করা উচিত। তিনি আরো বলেন, প্রত্যেক সন্তান তার আকিকার বিনিময়ে বন্ধক হিসেবে রক্ষিত। সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে আকিকা কর, নাম রাখ ও চুল কর্তন কর।[10]

ছেলের পক্ষ থেকে দু'টি ও মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বকরি আকিকা করা সুন্নত। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, ছেলের পক্ষ থেকে প্রতিদান হিসেবে দু'টি বকরি ও মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বকরি আকিকা করা সুন্নত। জন্মের সপ্তম দিন, সম্ভব না হলে ১৪তম দিন বা ২১তম দিন আকিকা করা সুন্নত। বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, সপ্তম দিন অথবা চতুর্দশ দিন অথবা একুশতম দিন আকিকা কর।[11]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজ উভয়ের মাধ্যমেই আকিকার প্রমাণ পাওয়া যায়। সালমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, বাচ্চার সঙ্গে আকিকার দায়িত্ব রয়েছে। সুতরাং তোমরা তার পক্ষ থেকে আকিকা কর এবং তার শরীর থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করে দাও।[12]

উম্মে কুরয আল-কা'বিয়া বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আকিকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেন, ছেলের পক্ষ থেকে দু'টি আর মেয়ের পক্ষ থেকে একটি পশু। নর-মাদি যে কোনো এক প্রকার হলেই চলে, এতে কোনো সমস্যা নেই।[13]

অধিকাংশ আলেম আকিকার গোস্ত পাকানো মুস্তাহাব বলেছেন, এমনকি সদকার অংশও। হ্যাঁ, পাকানো ব্যতীত বণ্টন করাও বৈধ। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, ছেলের পক্ষ থেকে সমমানের দু'টি আর মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বকরি জবেহ কর।[14]

---

[9] আবু দাউদ, সহীহ সূত্রে

[10] আহমদ ও সুনান গ্রন্থসমূহ, তিরমিযী হাদীসটি সহীহ বলেছেন।

[11] তিরমিযী

[12] সহীহ বুখারী

[13] আবু দাউদ, নাসাঈ

[14] আহমদ, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযীর নিকট হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মেয়ের পক্ষ থেকে একটি এবং ছেলের পক্ষ থেকে দু'টি বকরি জবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[15]

আরো জ্ঞাতব্য যে, কুরবানির পশুর ক্ষেত্রে যেসব শর্ত রয়েছে আকিকার পশুর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। অর্থাৎ পশুর কোনো অংশ মজদুরি হিসেবে দেওয়া যাবে না এবং এর চামড়া বা গোশত বিক্রি করা যাবে না বরং এর গোশত খাবে, সদকা করবে ও যাকে ইচ্ছে উপহার হিসেবে প্রদান করবে।

একদল আলেম বলেছেন, কুরবানিতে যেমন অংশিদারিত্ব বৈধ এখানে সে অংশিদারিত্ব বৈধ নয়। যদি কেউ গরু বা উটের মাধ্যমে আকিকা করতে চায় তাকে একজনের পক্ষ থেকে পূর্ণ একটি পশু জবেহ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ও বাণী থেকে এ মতই সঠিক মনে হয়।

ইবন হাযম রহ. বলেন, আকিকার পশুর হাড় ভাঙতে কোনো অসুবিধা নেই। যেসব বর্ণনায় আকিকার পশুর হাড় ভাঙতে নিষেধ করা হয়েছে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। অধিকন্তু তিনি আবু বকর ইবন আবু শায়বা রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, ইমাম যুহরী রহ. বলেছেন, আকিকার পশুর হাড় ও মাথা ভাঙা যাবে; কিন্তু তার রক্তের কোনো অংশ বাচ্চার শরীরে মাখা যাবে না।[16]

আকিকার কিছু উপকারিতা

(ক) আকিকা একটি ইবাদাত। এর দ্বারা বাচ্চা দুনিয়াতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর ইবাদত করার সৌভাগ্য অর্জন করে।

(খ) এর ফলে বাচ্চা বন্ধক মুক্ত হয় ও মাতা-পিতার জন্য সুপারিশ করার উপযুক্ত হয়।

(গ) এটা জানের সদকা। এর মাধ্যমে বাচ্চা তার জানের সদকা পেশ করে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈলের পক্ষে বকরি ফিদইয়া হিসেবে পেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَفَدَيۡنَٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِيمٖ ١٠٧﴾ [الصافات: ١٠٧]

“আর আমরা এক মহান যবেহের (একটি জান্নাতী দুম্বার) বিনিময়ে তাকে (ইসমাঈলকে) মুক্ত করলাম।” [সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ১০৭]

৬. নাম রাখা।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রথম দিন বা সপ্তম দিন নব জাতকের নাম রাখা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আজ রাতে আমার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আমার পিতা ইবারাহীমের নামানুসারে তার নামকরণ করেছি ইবরাহীম।[17]

---

[15] ইমাম তিরমিযীর নিকট হাদীসটি সহীহ ও হাসান।

[16] মুহাল্লা: ৭/৫২৩

[17] সহীহ মুসলিম

ইমাম আবু দাউদ, আহমদ, দারেমি, ইবন হিব্বান ও আহমদের বর্ণনাকৃত হাদীসের ভাষ্য মতে নবজাতকের নাম সুন্দর রাখা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নিজ নামে ও তোমাদের বাপ-দাদার নামে আহ্বান করা হবে। অতএব, তোমরা তোমাদের নাম সুন্দর করে নাও।

মুসলিমের হাদীসে রয়েছে, আল্লাহর পছন্দনীয় ও সর্বোত্তম নাম হচ্ছে, আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান। আবু দাউদের হাদীসে রয়েছে, সবচেয়ে সত্য নাম হচ্ছে, হারিস ও হাম্মাম। আর সবচেয়ে ঘৃণিত নাম হচ্ছে, হারব ও মুররাহ।

হারিস ও হাম্মাম-কে সবচেয়ে সত্য বলা হয়েছে এ হিসেবে যে, এ নামগুলোর অর্থের সঙ্গে মানুষের কর্ম ও প্রকৃতির পুরোপুরি মিল রয়েছে। কারণ, হারিস শব্দের অর্থ কর্মজীবি ও উপার্জনকারী আর হাম্মাম শব্দের অর্থ আকাঙ্ক্ষী ও ইচ্ছা পোষণকারী। প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এ স্বভাবগুলো পুরোপুরি বিদ্যমান। তাই এগুলো সবচেয়ে সত্য নাম। পক্ষান্তরে হারব শব্দের অর্থ যুদ্ধ-বিগ্রহ আর মুররাহ শব্দের অর্থ তিক্ততা-বিষাক্ততা। যেহেতু এসব শব্দ থেকে অশুভ লক্ষণ বুঝে আসে তাই এসব নামকে সবচেয়ে ঘৃণিত নাম বলা হয়েছে।

এর দ্বারা বুঝে আসে যে, যার অর্থ ভালো ও সুন্দর, এমন শব্দ দ্বারা নাম রাখা মুস্তাহাব। যেমন, নবীদের নাম, আল্লাহর সাথে দাসত্ব যুগ করে দেওয়া নাম এবং যেসব শব্দের অর্থ ভালো সেসব শব্দের নাম।

তবে যেসব শব্দের মধ্যে বড়ত্ব, অহমিকা, অহংকার ও আত্মপ্রশংসার অর্থ রয়েছে, সেসব শব্দের মাধ্যমে নাম রাখা ঠিক নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمۡۖ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ﴾ [النجم: ٣٢]

“কাজেই তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। কে তাকওয়া অবলম্বন করেছে, সে সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩২]

অতএব, এমন শব্দ দ্বারা নাম রাখা ঠিক নয়, যার মধ্যে আত্মপ্রসংশা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বাচ্চাদের, রাবাহ ও নাজীহ শব্দের মাধ্যমে নাম রাখতে বারণ করেছেন। সহীহ মুসলিমে সামুরা ইবন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা বাচ্চাদের ইয়াসার, রাবাহ, নাজিহ ও আফলাহ নাম রেখ না। (রাবাহ শব্দের অর্থ লাভ, নাজিহ শব্দের অর্থ শুদ্ধ-সুস্থ, ইয়াসার শব্দের অর্থ সহজতা ও আফলাহ শব্দের অর্থ সফলতা) কারণ, যখন তুমি এ নামে কাউকে ডাকবে আর সে ওখানে উপস্থিত না থাকলে উত্তর আসবে নেই।

এ থেকে কুলক্ষণ বুঝে আসে। অর্থাৎ ওখানে লাভ নেই, যা আছে ক্ষতি আর ক্ষতি ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাররাহ নাম রাখতেও নিষেধ করেছেন। (যার অর্থ পূণ্যবান নারী) যয়নব বিনতে আবু সালামা বলেন, তার নাম ছিল বাররাহ বিনতে আবু সালামা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা নিজদেরকে নিষ্পাপ ঘোষণা কর না। আল্লাহই ভালো জানেন কে নিষ্পাপ আর কে পূণ্যবান। তারা বলল, আমরা তাকে কী নামে ডাকব? তিনি বললেন, যয়নাব বলে ডাক।[18]

[18] সহীহ মুসলিম

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোনো কোনো স্ত্রীর নাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন। যেমন যয়নাব বিনতে জাহাশের নাম, জয়নাব বিনতে উম্মে সালামার নাম এবং জুয়াইরিয়া বিনতে হারেসের নাম। মুসলিমের বর্ণনা মতে তাদের প্রত্যেকের নাম ছিল বাররাহ।

আল্লাহর নামে নামকরণ করাও হারাম। যেমন, খালেক, রহমান, কুদ্দুস, আওয়াল, আখের, যাহির, বাতেন ইত্যাদি।

আল্লাহর এমন সব নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখাও নিষেধ, যার মাধ্যমে বড়ত্ব বা অহমিকার প্রকাশ পায়। যেমন, নুরুল্লাহ, নুরুল ইলাহ ইত্যাদি। এসব নামের মাধ্যমে নিজের পূণ্যতা ও আত্মপ্রশংসার প্রকাশ ঘটে অথচ বাস্তব তার বিপরীতও হতে পারে।

ইয়াসিন শব্দ দ্বারাও নাম রাখা নিষেধ। কারণ, এটা কুরআনের একটি সুরার নাম। কেউ কেউ বলেছেন, ইয়াসিন আল্লাহর নাম। আশহাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ইয়াসিন নাম রাখা কেমন? তিনি বলেন, আমি এটা অনুচিত মনে করি। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ইয়াসিন, ওয়াল-কুরআনিল হাকিম, ইন্নাকা লামিনাল মুরসালীন।

ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেছেন, আরো কিছু শব্দের মাধ্যমে নাম রাখা নিষেধ। অর্থাৎ কুরআনের নামে নাম রাখা, কুরআনের সূরার নামে নাম রাখা। যেমন, তাহা, ইয়াসিন, হা-মিম ইত্যাদি। উল্লেখ্য, ইয়াসিন, তাহা এগুলো নবীগণের নাম বলে যে কথা প্রচলিত আছে এর কোনো ভিত্তি নেই।

তাই আমাদের উচিত হবে নবীদের নামে, নেককার লোকদের নামে, সাহাবীগণের নামে বা যেসব শব্দের অর্থ ভালো তার মাধ্যমে বাচ্চাদের নামকরণ করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারাপ অর্থের নামগুলো ভাল অর্থের শব্দের দ্বারা পরিবর্তন করে দিতেন। সুনান আবু দাউদে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আসিয়া (অর্থ অবাধ্য) নামকে জামিলা (অর্থ সুন্দর) শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

নিষিদ্ধ নামের বিষয়ে মূলনীতি

ক. যেসব শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বুঝে আসে। যেমন, আব্দুর রাসূল, আব্দুল মুত্তালিব ও আব্দুন্নবি ইত্যাদি দ্বারা নাম রাখা নিষেধ।

খ. যেসব নাম আল্লাহর জন্য খাস অথবা আলিফ-লাম সংযুক্ত আল্লাহর কোনো গুণবাচক নাম। যেমন, আর-রহমান, আর-রহিম ইত্যাদি দ্বারা নাম রাখা নিষেধ।

গ. যেসব নাম খারাপ অর্থ বহন করে। যেমন, হারব, মুররাহ ও হুজ্‌ন (দুশ্চিন্তা) ইত্যাদি শব্দ দ্বারা নাম রাখা নিষেধ।

ঘ. যে সব নামের কোনো অর্থ নেই বা অর্থহীন শব্দ দ্বারা নাম রাখা নিষেধ। যেমন, জুজু, মিমি বা খৃষ্টীয় কোনো নাম। যেমন, নিকলু। তদ্রুপ পশ্চিমাদের নামে নামকরণ করাও নিষেধ। যেমন, দিয়ানা, অলিজা, সিমুন, জর্জ, মার্কস, লেলিন, লিটন, মিল্টন ইত্যাদি।

ঙ. যেসব শব্দের মধ্যে বড়ত্ব, অহংকার, নিষ্পাপ ও আত্মপ্রশংসার অর্থ রয়েছে, সেসব শব্দ দ্বারা নাম রাখাও নিষেধ। যেমন, শাহানশাহ, আলমগীর, জাহাঙ্গীর ইত্যাদি।

৭. খাৎনা করানো

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলে, হে আল্লাহর রাসূল, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তিনি বললেন, কুফরির চুল মুণ্ডিয়ে ফেল আর খাৎনা কর।[19]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব পাঁচটি। যথা:

ক. খাৎনা করা।

খ. নাভির নিচের পশম পরিস্কার করা।

গ. বগলের নিচের পশম উপড়ানো।

ঘ. নখ কর্তন করা।

ঙ. মোচ ছোট করা।[20]

ইমাম নববি রহ. বলেন, এখানে প্রকৃতগত স্বভাবের অর্থ সুন্নত।

খাৎনার সময়: সপ্তম দিন খাৎনা করানো সুন্নত। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হাসান এবং হুসাইনের সপ্তম দিন আকিকা দিয়েছেন ও খাৎনা করিয়েছেন।[21]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আশি বছর বয়সে খাৎনা করেছেন। আর ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অনুসরণ করার জন্য আমরা আদিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন,

﴿ثُمَّ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ۝١٢٣﴾ [النحل: ١٢٣]

“তারপর আমরা আপনার প্রতি অহী পঠিয়েছি যে, আপনি মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ করেন, যে ছিল একনিষ্ঠ এবং ছিল না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৩]

মূলতঃ খাৎনার বয়স জন্মের এক সপ্তাহ পর থেকে শুরু হয়। তবে সাত বছর পুরো হওয়ার আগেই তা সেরে নেওয়া ভালো। সাবালক হওয়ার পূর্বে খাৎনা করা অবশ্য জরুরি। ডাক্তারি বিদ্যা প্রমাণ করেছে যে, জন্মের এক সপ্তাহ পর থেকে তিন বৎসরের মধ্যে খাৎনা সম্পাদন করা উত্তম।

খাৎনার বিধানের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, খাৎনা সুন্নত। ইমাম শাফি, মালেক ও আহমদ রহ. বলেন, খাৎনা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে ইমাম মালেক রহ. আরো কঠোর অবস্থান নিয়ে বলেছেন, যে খাৎনা করবে না তার ইমামত ও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কাজি আয়াজ রহ. বলেছেন, অধিকাংশ আলেমদের নিকট খাৎনা সুন্নত, এ সুন্নত পরিত্যাগ করা গোনাহ।

পরিশিষ্ট:

[19] আবু দাউদ

[20] সহীহ বুখারী

[21] তাবরানী ফিল আওসাত ও বায়হাকী

গর্ভবতী নারী সন্তান প্রসবের পূর্বে, প্রসবের সময় বা পরে, যা ইচ্ছে তাই দো'আ করতে পারে। এ সময়ের জন্য নির্দিষ্ট কোনো দো'আ নেই। আবার এ সময় দো'আ কবুল হয় এমন ওয়াদাও নেই। তবে সন্তান প্রসব কঠিন বা ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় প্রসব বেদনা-কাতর নারী নিরুপায় ও মুসিবতগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত, সে হিসেবে বলা যায় এটা তার দো'আ কবুল হওয়ার মুহূর্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ﴾ [النمل: ٦٢]

“বরং (আল্লাহ) তিনি, যিনি নিরুপায়ের ডাকে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন।” [সুরা আন-নামল, আয়াত: ৬২]

উল্লেখ্য, কুরআনের আয়াত বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা প্রসবকালীন নির্দিষ্ট কোনো দো'আ বা আমল প্রমাণিত নেই। এ ক্ষেত্রে সাধারণ দো'আই যথেষ্ট। যেমন, যাকারিয়া আলাইহিস সালাম সন্তানের জন্য দো'আ করেছিলেন,

﴿رَبِّ لَا تَذَرۡنِي فَرۡدٗا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡوَٰرِثِينَ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ وَوَهَبۡنَا لَهُۥ يَحۡيَىٰ وَأَصۡلَحۡنَا لَهُۥ زَوۡجَهُۥٓۚ﴾ [الانبياء: ٨٩، ٩٠]

“হে আমার রব! আমাকে একা রেখো না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী। অতঃপর আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া। আর তার জন্য তার স্ত্রীকে উপযোগী করেছিলাম। [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৮৯-৯০]

মারইয়াম আলাইহাস সালামের প্রসব প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَأَجَآءَهَا ٱلۡمَخَاضُ إِلَىٰ جِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ قَالَتۡ يَٰلَيۡتَنِي مِتُّ قَبۡلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسۡيٗا مَّنسِيّٗا ٢٣ فَنَادَىٰهَا مِن تَحۡتِهَآ أَلَّا تَحۡزَنِي قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تَحۡتَكِ سَرِيّٗا ٢٤ وَهُزِّيٓ إِلَيۡكِ بِجِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ تُسَٰقِطۡ عَلَيۡكِ رُطَبٗا جَنِيّٗا ٢٥ فَكُلِي وَٱشۡرَبِي وَقَرِّي عَيۡنٗاۖ﴾ [مريم: ٢٣، ٢٦]

“অতঃপর প্রসব-বেদনা তাকে খেজুর গাছের কাণ্ডের কাছে নিয়ে এলো। সে বলল, হায়! এর আগেই যদি আমি মরে যেতাম এবং সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হতাম। তখন তার নিচ থেকে সে তাকে ডেকে বলল যে, তুমি চিন্তা করো না। তোমার রব তোমার নিচে একটি ঝর্ণা সৃষ্টি করেছেন। আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে তোমার দিকে নাড়া দাও, তাহলে তা তোমার উপর তাজা-পাকা খেজুর ফেলবে। অতঃপর তুমি খাও, পান কর এবং চোখ জুড়াও”। [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ২৩-২৬]

এ থেকে অনেকে বলেছেন, প্রসবের পূর্বে তাজা-পাকা খেজুর খাওয়া, পানীয় দ্রব্য পান করা ও আগত সন্তানের কথা স্মরণ করে শান্ত, শঙ্কামুক্ত ও প্রসন্ন থাকা, অন্তরে কোনো ধরনের ভয়-ভীতি বা পেরেশানী স্থান না দেওয়া সহজে প্রসব হওয়ার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখে।

সুস্থ ও সুন্দরভাবে বাচ্চা প্রসব হলে মা নিজেকে ধন্য মনে করেন। নতুন জীবন নিয়ে কলিজার টুকরা দুনিয়ার আলো-বাতাস দেখছে ভেবে খুব আনন্দিত হন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা অতি আদরে তার বাচ্চাকে কাছে টেনে নেন এবং নিজ বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন। এটাই স্বাভাবিক, হাসপাতালের নার্স কিংবা দাত্রীদের তাই করা উচিত। তারা সর্ব প্রথম মার হাতে তার সন্তান তুলে দেবেন। অনেকে বলেন, এ সময় মার বুকের স্পর্শ সন্তানের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলে এবং পরবর্তীতে মা-সন্তানের সম্পর্কে বিরাট ভূমিকা রাখে। এর ফলে বাচ্চা সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে সক্ষম হয়, উভয়ের মাঝে মধুর ঘনিষ্টতা সৃষ্টি হয়। অন্যথায় মা-সন্তানের মাঝে সম্পর্কের টানাপোড়েন কিংবা ভিন্ন তিক্তার জন্ম হতে পারে।

﴿رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٧٣]

“হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন, যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকিদের নেতা বানিয়ে দিন।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭৪]

﴿رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلۡ دُعَآءِ ٤٠﴾ [ابراهيم: ٤٠]

“হে আমাদের রব, আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব, আমার দো‘আ কবুল করুন।” [সুরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪০]

সমাপ্ত